সোনার বাংলা ও রবীন্দ্রনাথ

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

আমাদের দেশের পোশাকি, সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। দেশের লোক আদর করে বলে, 'সোনার বাংলা'। রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' গানের আগে থেকে এই আদরের নাম দেশে প্রচলিত ছিল। কত আগে থেকে তা বলতে আমি পারব না। তবে ১৩০২ বাংলা সালে প্রকাশিত *হুতোম প্যাঁচার নক্সায়* আছে-

'নীলবাঁদরে সোনার বাঙ্‌লা করে ছারখার (গান)।

হ্যালো সোনার বাংলা খান, পোড়ালে নীল হনুমানে।'

'আমার সোনার বাংলা' আমাদের জাতীয় সঙ্গীত এবং বড় বেদনার গান। ১৯৭১ সালে যখন মানুষের শত্রুরা মানবাধিকার লঙ্ঘন করে তখন মায়ের মুখ মলিনবদন ধারণ করে। সেই সময় এই গান আমাদের বড় আপন হয়ে দেখা দিয়েছিল। দেশের শোভা, ছায়া, স্নেহ ও মায়ার টানে দেশকে ভালোবেসে বাংলাদেশের অধিকৃত অঞ্চলে দেশের মানুষ নিভৃতে সংগোপনে এই গান শোনে এবং মুক্ত অঞ্চলে প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠে গায়।

বাঙালিদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে দুঃখ থাকলেও এই সোনার বাংলার ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু বা আকাশ-বাতাস নিয়ে তাঁর মনে কোনো দুঃখ ছিল না। বৈশাখের দাহদিন, বর্ষার খিতখিতে জলকাদা বা ভাদ্রের ভ্যাপসা গুমসা নিয়ে তাঁর কোনো অনুযোগ ছিল না।

২৩ জুন ১৮৯১ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের এক অনন্য সৌন্দর্যের বর্ণনা করেন, 'আমি বসে বসে ভাবছিলুম, আমাদের দেশের মাঠ ঘাট আকাশ রোদ্দুরের মধ্যে এমন একটা সুগভীর বিষাদের ভাব কেন লেগে আছে? তার কারণ এই মনে হল, আমাদের দেশে প্রকৃতিটা সবচেয়ে চোখে পড়ে-আকাশ মেঘমুক্ত, মাঠের সীমা নেই, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে, এরমধ্যে মানুষকে অতি সামান্য মনে হয়-মানুষ আসছে এবং যাচ্ছে, এই খেয়া নৌকোর মতো পারাপার হচ্ছে তাদের অল্প অল্প কলবর শোনা যাচ্ছে, এই সংসারের হাটে ছোটোখাটো সুখ দুঃখের চেষ্টায় একটুখানি আনাগোনা দেখা যায়-কিন্তু এই অনন্ত প্রসারিত প্রকাণ্ড উদাসীন প্রকৃতির মধ্যে সেই মৃদুগুঞ্জন, সেই একটু আধটু গীতধ্বনি, সেই নিশিদিন কাজকর্ম কী সামান্য, কী ক্ষণস্থায়ী; কী নিষ্ফল কাতরতা-পূর্ণ মনে হয়। এই নিশ্চেষ্ট নিস্তব্ধ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্দেশ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বৃহৎসৌন্দর্যপূর্ণ নির্বিকার উদার শান্তি দেখতে পাওয়া যায় এবং তারই তুলনায় আপনার মধ্যে এমন একটা সততসচেষ্ট পীড়িত জর্জরিত ক্ষুদ্র নিত্যনৈমিত্তিক অশান্তি দেখতে পাওয়া যায় যে, ঐ অতিদূর নদীতীরের ছায়াময় নীল বনরেখার দিকে চেয়ে নিতান্ত উন্মনা হয়ে যেতে হয়।'

বাংলাদেশের সৌন্দর্য বর্ণনায় ২ ডিসেম্বর ১৮৯২ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লিখিত আর এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাংলাদেশের ধু ধু জনহীন মাঠ এবং তার প্রান্তবর্তী গাছপালার মধ্যে সূর্যাস্ত সে কী সুন্দর সে আমি কিছুতে [বলতে] পারি নে-কী একটি বিশাল শান্তি এবং কোমল করুণা-আমাদের এই আপনাদের পৃথিবীর সঙ্গে আর ঐ বহুদূরবর্তী আকাশের সঙ্গে কী-একটি [স্নেহভারবিনত] মৌন ্লান মিলন। অনন্তের মধ্যে যে একটি প্রকাণ্ড অখণ্ড চিরবিরহবিষাদ আছে সে এই সন্ধ্যেবেলাকার পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে কী-একটা [উদাস] আলোকে আপনাকে ঈষৎ প্রকাশ করে দেয়-সমস্ত জলে স্থলে আকাশে কী একটি ভাষাপরিপূর্ণ নীরবতা-অনেকক্ষণ চুপ করে অনিমেষনেত্রে চেয়ে দেখতে [দেখতে] মনে হয় যদি এই চরাচরব্যাপ্ত পূর্ণনীরবতা আপনাকে আর ধারণ করতে না পারে, সহসা তার অনাদি ভাষা যদি বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়, [তা হলে] কী-একটা গভীর শান্ত সুন্দর সকরুণ সঙ্গীত পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত বেজে ওঠে! আসলে তাই হচ্ছে। কেননা, জগতের যে কম্পন আমাদের [চক্ষে] এসে আঘাত করছে তাই আলোক, আর যে কম্পন কানে এসে আঘাত করছে তাই শব্দ। আমরা একটু নিবিষ্টচিত্তে স্থির হয়ে চেষ্টা করলে জগতের সমস্ত [সম্মি] লিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটি বিপুল সংগীতে খানিকটা তর্জমা করে নিতে পারি। এই জগৎবাসী দৃশ্যপ্রবাহের অবিশ্রাম। [কম্পন] ধ্বনিকে কেবল একবার চোখ বুজে মনের কান দিয়ে শুনতে হয়। কিন্তু তোকে আমি সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের কথা কতবার লিখব! আমি নিত্য নূতন [করে] অনুভব করি কিন্তু নিত্য নূতন করে কি প্রকাশ করতে পারি!'

রবীন্দ্রনাথের কাছে দেশের একঘেয়ে সমতল ছিল বড় আপনার। ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লিখিত এক পত্রে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির প্রতি তাঁর টান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন. 'অনেকে বাংলাদেশকে সমতলভূমি বলে আপত্তি প্রকাশ করে, কিন্তু সেই জন্যেই বাংলাদেশের মাঠের দৃশ্য, নদীতীরের দৃশ্য, আমার এত বেশি ভালো লাগে। যখন সন্ধ্যার আলোকে এবং সন্ধ্যার শান্তি উপর থেকে নামতে থাকে তখন সমস্ত অনবরুদ্ধ আকাশটি একটি নীলকান্ত মণির পেয়ালার মতো আগাগোড়া পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে, যখন স্তিমিত শান্ত নীরব মধ্যাহ্ন তার সমস্ত সোনার আঁচলটি বিছিয়ে দেয় তখন কোথায় যে বাধা পায় না-চেয়ে চেয়ে দেখবার এবং দেখে দেখে মনটা ভরে নেবার এমন জায়গা আর নেই।'

আলোচনায় 'স্বদেশ'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমার একজন বন্ধু দার্জিলিং কাশ্মীর প্রভৃতি নানা রমণীয় দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বলিলেন-বাঙ্গালার মত কিছুই লাগিল না। কথাটা শুনিয়া অধিকাংশ লোকই হাসিবেন। কিন্তু হাসিবার বিশেষ কারণ দেখিতেছি না। বরং যাঁহারা বলেন বাঙ্গালায় দেখিবার কিছুই নাই, সমস্তটাই প্রায় সমতল স্থান, পাহাড় পর্বত প্রভৃতি বৈচিত্র্য কিছুই নাই, দেশটা দেখিতে ভালোই নহে, তাঁহাদের কথা শুনিলেই বাস্তবিক আশ্চর্য বোধ হয়। বাঙ্গালা দেশ দেখিতে ভালো নয়! এমন মায়ের মত দেশ আছে! এত কোল-ভরা, শস্য, এমন শ্যামল পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, এমন স্নেহধারাশালিনী ভাগীরথীপ্রাণা কোমলহৃদয়া, তরুলতাদের প্রতি এমনতর অনির্বচনীয় করুণাময়ী মাতৃভূমি কোথায়! একজন বিদেশী আসিয়া যাহা বলে শোভা পায়, কিন্তু আজন্মকাল ইহার কোলে যে মানুষ হইয়াছে সেও ইহার সৌন্দর্য দেখিতে পায় না! সে ব্যক্তি যে প্রেমিক নহে ইহা নিশ্চয়ই। সুতরাং বাংলাদেশে সে বাস করে মাত্র, কিন্তু বাংলাদেশ সে দেখেই নি-বাংলাদেশে সে কখনো যায়নি, ম্যাপে দেখিয়াছে মাত্র। এত দেশে গিয়াছি, এত নদী দেখিয়াছি, কিন্তু বাংলার গঙ্গা যেমন এমন নদী আর কোথাও দেখি নাই। কিন্তু কেন? অমুক দেশে একটা নদী আছে সেটা গঙ্গার চেয়ে চওড়া-অমুক সাগরে একটা নদী পড়িয়াছে সেটা গঙ্গার চেয়ে দীর্ঘ-অমুক স্থানে একটা নদী বহিতেছে, গঙ্গার চেয়ে তার তরঙ্গ বেশি। ইত্যাদি।'

২৫ এপ্রিল ১৯৩৪ অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা এক চিঠিতে য়ুরোপের সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভূমির প্রতি তাঁর আকর্ষণ এক আবেগময় ভাষা প্রকাশ করেন, 'য়ুরোপে মানবমনের সংঘাতে মনের নিগূঢ় শক্তি চরম পূর্ণতায় উদ্বোধিত হয় তাও আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি। তবু অনেকখানি বাকি থাকে, সেটা হচ্ছে অন্তরতম সম্বন্ধ, তাকে বিশেষণ করে জানাতে পারিনে। অসংখ্য সূক্ষ্ম স্নায়ুর সমাবেশে তার বহুধা বেদনা আমার সমস্ত মনকে জড়িয়ে রেখেছে-জন্মপূর্বের স্মৃতি আছে তার মধ্যে, আমার শ্রুতিতে, আমার চিন্তায় আমার আকাঙ্ক্ষায় জীবনের বহুতন্ত্রবিশিষ্ট বীণায় সে আপন সুর বেঁধে দিয়েছে। তার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হলে আমার ভোজে খাদ্য থাকে, এমন কি খাদ্য বেশিও থাকে কিন্তু তার স্বাদ থাকে না। এই কারণে যতবার আমি দেশের বাইরে গেছি এখানকার রূপে রসে ভরা আকাশ আমাকে ডাক দিয়ে পাঠায়। তাছাড়া ছেলেবেলা থেকে সমস্ত মন দিয়ে আমি ভালোবেসেছি বাঙালীর মেয়েকে তার সকরুণ মাধুর্য্যে আমার মন অভিষিক্ত হয়েছে। যখন দূরে যাই এখানকার শ্যামশ্রীর স্মৃতিপটে তারি ছবিটি ফুটে ওঠে আমার মনে, মেঠো মূলতানের সুরে দূর থেকে বাজতে থাকে তারি কণ্ঠের গান বাংলার ভাষায়-'মনে রইল সই মনের বেদনা,/প্রবাসে যখন যায়গো সে/তারে বলি বলি আর বলা হোলো না।'

তখন কেবলি মনে পড়তে থাকে তমালতালীবনরাজিনীলা তটভূমি, সমুদ্রের পূর্বপারে। আর মনে পড়ে মেঘচ্ছায়াঘন বর্ষার দিন আর ধারামুখরিত বর্ষার রাত্রি; বুকের মধ্যে বাজতে থাকে, মেঘৈর্মেদুরমম্বরংবনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ। অন্য কোনোদেশে পাব মাঘের শেষে আমের বোলের গন্ধের সঙ্গে মেশানো ক্লান্ত কোকিলের করুণ ডাক।'

ওই চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'দেশকে আমি যতই ভালোবাসি না কেন, অনিবার্যকারণে আমার মন তবু আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র।'

৯ অক্টোবর ১৯১৩ আমেরিকা প্রবাসী শান্তিনিকেতনের আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'প্রবাসের পালা শেষ করে আবার আমাদের সেই আশ্রমে এসে বসেছি। কত আরাম সে আর বলতে পারি নে। দেশ-বিদেশে সম্মান সম্বর্ধনা তো অনেক পেয়েছি কিন্তু এখানকার খোলা আকাশের এই নির্মল আলোকে প্রতিদিন যে অভিষেক হয় তার কাছে কিছুই লাগে না।'

১৯ মে ১৯২০ সালে কন্যা মীরা দেবীকে তিনি লিখছেন, 'বেশিদিন যে য়ুরোপে থাকবো না সে-সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা ভাল লাগ্‌ছে না। পাশ্চাত্য দেশে সর্বদা বেশভূষা করে জুতো মোজা পরে প্রস্তুত

হয়েই থাকতে হয়। দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই অপ্রস্তুত হয়ে থাকা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে-সেই জন্য বোতাম এঁটে থাকতে আমার বড় খারাপ লাগে।' জুন মাসে ওই বছর রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'এখানকার এই মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং লন্ডনের ভিড় আমাকে যেন চেপে মারচে। প্রতিদিনই দেশে ফেরার জন্য চিত্ত ব্যথিত হয়ে উঠচে।'

নিউইয়র্কে তার এক মুহূর্তের জন্যও ভালো লাগেনি। মার্কিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তিনি কন্যাকে লিখছেন, 'এখানকার জীবনযাত্রা আমাদের অভ্যাসের এতই বিরুদ্ধ, যেন দিনরাত্রি মনকে উজানস্রোতে সাঁতার দিতে হয়-প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে।'

মংপু থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ পৌত্রি নন্দিনী দেবীকে তিনি লিখছেন, 'আমি সমভূমির মানুষ-চোখের সামনে চাই অবারিত আকাশ, আর গায়ের উপরে চাই হালকা কাপড়-মোটা কাপড় জবড়জঙ্গ হয়ে পাথরের পাহারায় বন্দী হয়ে থাকতে মন চায় না।'

রবীন্দ্রনাথ বড় আবেগে আপ্লুত হয়ে নানা লেখায়-গদ্যেপদ্যে-বাংলার নৈসর্গ শোভার বন্দনা করেন। তবে ভারত তাঁর কাছে ছিল ভারততীর্থ-এক মহাজাতির নাম। 'মহাজাতি সদনে' তিনি বলেন, 'বাংলার যে জাগ্রত হৃদয় মন আপন বুদ্ধির ও বিদ্যার সমস্ত সম্পদ ভারতবর্ষের মহাবেদীতলে উৎসর্গ করবে বলেই ইতিহাসবিধাতার কাছে দীক্ষিত হয়েছে, তার সেই মনীষিতাকে এখানে আমরা অভ্যর্থনা করি। আত্মগৌরবে সমস্ত ভারতের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য থাকুক, আত্মাভিমানের সর্বনাশা ভেদবুদ্ধি তাকে পৃথক না করুক-এই কল্যাণ ইচ্ছা এখানে সংকীর্ণচিত্ততার ঊর্ধ্বে আপন জয়ধ্বজা যেন উড্ডীন রাখে।'

'বাঙালির আশা, কাজ পণ ও ভাষা সত্য হোক এবং বাঙালির প্রাণ, মন ও ভাইবোনেরা এক হোক'-ভাগবানের কাছে এই প্রার্থনা করে 'মহাজাতি সদনে' রবীন্দ্রনাথ এই আশা করেন যে, 'বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক, বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক, ভারতের মুক্তি-সাধনায় বাঙালি স্বৈরবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো কারণেই নিজেকেই অকৃতার্থ যেন না করে।'

'আমার সোনার বাংলা'র কবি বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের সন্তান বলে উপলব্ধি করার সুযোগ লাভ করিনি। বাংলাদেশের ছোটঘরে আমার গর্ব করার স্থান ছিল, কিন্তু ভারতের বড় ঘরে আমার আনন্দ করবার স্থান।'